প্রথম আলো

তারিখঃ ০৬-০৮-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

সুগন্ধি চাল রপ্তানির দুয়ার খুলল

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন

অনুমতি দেওয়ার পর রপ্তানি হয় ৬ হাজার ৭৮৬ টন সুগন্ধি চাল। বাকি ১৮ হাজার টন রপ্তানির জন্য আগের ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

> বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি সুগন্ধি চালের ভালো বাজার রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে রপ্তানি অনুমোদন পাওয়ায় আমরা উৎসাহ বোধ করছি।
>
> **কামরুজ্জামান কামাল**
> পরিচালক (বিপণন), প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ

সুগন্ধি চাল রপ্তানির সুযোগ আবার উন্মুক্ত করেছে সরকার। আগে যারা এ চাল রপ্তানির সুযোগ পেয়েছিল, এ দফায় তাদেরই সুযোগ দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। চাইলে নতুন রপ্তানিকারকেরাও আবেদন করতে পারবেন। যদিও নতুনদের ব্যাপারে সরকার একটু রক্ষণশীল থাকবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

রপ্তানি নীতি আদেশ অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে সব সময়ই চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সুগন্ধি চাল রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। ২০২১ সালের জুলাইয়ে ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেয় সরকার। তবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি বন্ধও করে দেওয়া হয়। এর মধ্যে রপ্তানি হয় ৬ হাজার ৭৫৬ টন সুগন্ধি চাল।

ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার পর গত ৩০ জুলাই আবার সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়। আগে অনুমোদন পাওয়া ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ১৮ হাজার ২৪৪ টন সুগন্ধি চাল তারা ২০২৪ সালের ৩০ জুনের মধ্যে রপ্তানি করতে পারবে।

বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অনুমতি দেওয়ার পর রপ্তানিও হচ্ছিল। তবে চালের দাম বাড়তে থাকায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে আমরা তা বন্ধ রেখেছিলাম। এখন আবার তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। নতুন কিছু আবেদনও জমা পড়েছে, যাদের অনুমতি দিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় একটু ধীরগতিতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, রপ্তানিযোগ্য চাল স্বচ্ছ প্যাকেটে প্যাকেটজাত করতে হবে, শুল্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করাতে হবে এবং জাহাজীকরণ শেষে রপ্তানিবিষয়ক কাগজপত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, বাংলাদেশ দেড় বছর ধরে মার্কিন ডলার-সংকটে রয়েছে। সুগন্ধি চাল রপ্তানির মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায় তা-ও বন্ধ হয়ে যায়। তাই রপ্তানিকারকেরা গত জানুয়ারি থেকে বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আসছেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলছে, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে সুগন্ধি চাল রপ্তানির সুযোগ বহাল রাখা বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। গত জানুয়ারি থেকে রপ্তানি পুনরায় চালুর জন্য রপ্তানিকারকদের আবেদন আসতে থাকলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের শরণাপন্ন হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত দিতে সময় নেয় পাঁচ মাস। এই ফাঁকে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনকে (বিটিটিসি) সার্বিক দিক বিবেচনা করে প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সুগন্ধি চালের বড় রপ্তানিকারক প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ। গ্রুপটির পরিচালক (বিপণন) কামরুজ্জামান কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি সুগন্ধি চালের ভালো বাজার রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নতুন করে রপ্তানি অনুমোদন পাওয়ায় আমরা উৎসাহ বোধ করছি।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, দেশে বছরে গড়ে সুগন্ধি চাল উৎপাদন হয় ১৮-২০ লাখ টন। আর প্রতিবছর গড়ে রপ্তানি হয় ১০ হাজার টন। বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিশ্বের ১৩০টির বেশি দেশে সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়।

২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ সুগন্ধি চাল রপ্তানি শুরু করে। প্রথম বছর ৬৬৩ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়। পরের বছরগুলোতে রপ্তানির পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০ হাজার ৮৭৯ টনে উন্নীত হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৬ লাখ, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮৫ লাখ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫১ লাখ মার্কিন ডলারের সুগন্ধি চাল রপ্তানি হয়েছে।

দেশে রপ্তানিযোগ্য সুগন্ধি চালের একটি তালিকা রয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে। চালগুলো হচ্ছে কালিজিরা, কালিজিরা টিপিএল-৬২, চিনিগুঁড়া, চিনি আতপ, চিনি কানাই, বাদশাভোগ, কাটারিভোগ, মদনভোগ, রাঁধুনিপাগল, বাঁশফুল, জটাবাঁশফুল, বিন্নাফুল, তুলসীমালা, তুলসী আতপ, তুলসী মণি, মধুমালা, খোরমা, সাককুর খোরমা, নুনিয়া, পশুশাইল, দুলাভোগ ইত্যাদি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কেউ আংশিক রপ্তানি করলেও কেউ একদমই পারেনি। যেমন সিটি অটো রাইস অ্যান্ড ডাল মিলস ১ হাজার টন, এইচআইএফএস অ্যাগ্রো ফুড লিমিটেড ১ হাজার টন, মারজান ফুডস লিমিটেড ৩০৮ টন, স্মরণিকা ইন্টারন্যাশনাল ৪০০ টন, অনন্ত বাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ ৫০ টন, ডিএইচএস ইন্টারন্যাশনাল ১ হাজার টন, মক্কা কনজ্যুমারস প্রোডাক্ট ১ হাজার টন এবং মা অ্যাগ্রো ২০০ টন সুগন্ধি চাল রপ্তানির অনুমোদন নিয়েও তা করতে পারেনি।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৪-০৮-২০২৩ (পৃঃ ০৫)

জলবায়ু সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন

এবারে ব্রি ধান-২৮ এবং ব্রি ধান-২৯ নিয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জাত দুটো শুধু বোরো মৌসুমের জন্য ১৯৯৪ সালে অবমুক্ত করা হয়। এদের জীবনকাল যথাক্রমে ১৪০ দিন ও ১৬০ দিন। ফলন হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ৬.০ টন এবং ৭.৫ টন। জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠতে এদের ১২ থেকে ১৪ বছর সময় লাগে। সমগ্র বোরো আবাদের অধিকাংশ জায়গা দখল করে নেয়। নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এখনও তারা বেশ জনপ্রিয় এবং মাঠে টিকে আছে। এভাবে কোনো জাত একইভাবে একই জমিতে যদি বছরের পর বছর চাষ করা হয় তাহলে তাদের পরিণতি ভালো হয় না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজিত রোগবালাই ও পোকামাকড়ের জাত-উপজাতগুলো ক্রমে ক্রমে প্রচলিত জাতগুলোর ওপর বেশি করে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। বিষয়টি বিজ্ঞানীদের যে জানা নেই এমন নয়। এজন্য এদের মাঝামঝি বা বিকল্প কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন– ব্রি ধান-৫৮। ফলন ব্রি ধান-২৯এর মতো, কিন্তু জীবনকাল সপ্তাহখানেক কম। চালের গুণাগুণ ব্রি ধান-২৯ এর মতো। কিন্তু ব্রি ধান-২৯ এর সঙ্গে খুব একটা পেরে উঠেছে বলে মনে হয় না। এরপরে বোরোর জন্য যত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, এদের হয় ব্রি ধান-২৮ বা ব্রি ধান-২৯ এর বিকল্প হিসাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একই ভাবে রোপা আমনের জন্যও বিআর-১১ এর চেয়ে কম সময়ে জন্মানো যায় এমন জাত বের করা হয়। কারণ, আমনের পরে যেন সহজেই আরেকটি রবি ফসল ঘরে তোলা যায়। ব্রি ধান-৩০, ব্রি ধান-৩১ এবং ব্রি ধান-৩২ সে ধারারই কয়েকটি জাত। এদের জীবনকাল যথাক্রমে ১৪৫, ১৪০ এবং ১৩০ দিন। এদের মধ্যে ব্রি ধান-৩২ কিছুটা সুবিধা করতে পারলেও বাকিগুলো টেকেনি। এর পরের আমনের জাতগুলোর জীবনকাল আরও কমে আসে। ১৯৯৭ সালে অবমুক্ত আমনের জাত ব্রি ধান-৩৩ এর জীবনকাল মাত্র ১১৮ দিন। ফলে জাতটি উত্তরবঙ্গে মঙ্গা দূরীকরণে ব্যবহৃত হয়। পাট জন্মানো এলাকায় রিলে-ক্রপ (একটি ফসল কাটার আগেই আরেকটি ফসল বুনে দেওয়া) হিসেবে বুনে দিয়ে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব হয়। এর পরে আমন ধানের জীবনকাল ১০০ দিনে নামিয়ে আনা গেছে। যেমন– প্রথম উদ্ভাবিত জিঙ্ক-সমৃদ্ধ ব্রি ধান-৬২। এভাবেই পরবর্তীকালে কিছু জাত বৈরী পরিবেশে সহনশীল বা বালাই প্রতিরোধী করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন– বোরো মৌসুমের লবণাক্ত এলাকার জন্য লবণসহিষ্ণু জাত ব্রি ধান-৪৭ ও ব্রি ধান-৬৭ ইত্যাদি। ব্রি ধান-৪৭ এর প্লান্ট আর্কিটেকচার খুব সুন্দর। পারফরমেন্সও খারাপ ছিল না। ব্রি ধান-৬৭ রূপেগুণে ব্রি ধান-২৮এর কাছাকাছি এবং লবণাক্ত এলাকার উপযোগী। জাতটি মোটামুটি শীতসহিষ্ণু হওয়ায় হাওড়ের চাষিরাও ইদানীং পছন্দ করছেন। তারপরও চাষিরা স্বর্ণা এবং বিআর-১১ এর মতো জাত ছাড়তে অনীহা প্রকাশ করে আসছিলেন। তাই বিজ্ঞানীরা জাত দুটোর মধ্যে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসাবে রোপণ পরবর্তী জলমগ্নসহিষ্ণুতা সংযোজন করে দিলেন। তারা মার্কার অ্যাসিসটেড সিলেকশন (বিশেষ ধরনের জীবপ্রযুক্তি) প্রক্রিয়ায় ব্যাক-ক্রস করে বিআর-১১ এবং স্বর্ণার উন্নত সংস্করণ জলমগ্নসহিষ্ণু ব্রি ধান-৫১ (স্বর্ণা সাব-১) এবং ব্রি ধান-৫২ (বিআর-১১ সাব-১) উদ্ভাবন করেন। একই ভাবে জলমগ্নসহিষ্ণু আরও কিছু জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে জলমগ্নপ্রবণ এলাকার জন্য। জোয়ার-ভাটাপ্রবণ এলাকার উপযোগী জাত হলো ব্রি ধান-৭৭। খরাপ্রবণ এলাকার জন্যও রোপা আমন মৌসুমের উপযোগী কয়েকটি জাত (ব্রি ধান-৫৬, ব্রি ধান-৫৭, ব্রি ধান-৬৬, ব্রি ধান-৭১) উদ্ভাবন করা হয়। পাশাপাশি বেশি বেশি জিঙ্ক-সমৃদ্ধ এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির (উৎসব-অনুষ্ঠানের উপযোগী) কিছু জাতও উদ্ভাবন করা হয়। বোরো মৌসুমের জন্য জিঙ্কসমৃদ্ধ জাতগুলো হলো ব্রি ধান-৭২, ব্রি ধান-৭৪, ব্রি ধান-৮৪, বঙ্গবন্ধু ধান-১০০। রোপা আমন মৌসুমের জিঙ্কসমৃদ্ধ জাতগুলো হলো ব্রি ধান-৬২ এবং ব্রি ধান-৭২। কিছু কিছু জাত আছে একের মধ্যে একাধিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। যেমন–ব্রি ধান-৭৮ জলমগ্নতা এবং লবণ দুই-ই মোটামুটি সহ্য করতে পারে। এগুলোকে ২-রহ-১জাতও বলা যেতে পারে।

দিন দিন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাতের চাহিদা বাড়ছে। বোরো মৌসুমের প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাতগুলো হলো ব্রি ধান-৫০, ব্রি ধান-৬৩, এবং ব্রি ধান-১০৪। এদের জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ এর আশপাশে। রোপা আমনের প্রিমিয়াম কোয়ালিটি জাতগুলোর মধ্যে ব্রি ধান-৩৪, ব্রি ধান-৩৭, ব্রি ধান-৩৮, ব্রি ধান-৭০, ব্রি ধান-৮০, ব্রি ধান-৯০ ইত্যাদি। এগুলো (ব্রি ধান-৮০ ছাড়া) সুগন্ধী জাতের। আউশ মৌসুমের জন্য ব্রি ধান-৪৮ এবং ব্রি ধান-৮২ উদ্ভাবন করা হয়। ব্রি ধান-৮২, ব্রি

জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

ধান-৪৮ থেকে কয়েকদিন আগাম। সাম্প্রতিককালে বোরো, আমন এবং আউশের জন্য যে জাতগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে, সেগুলো জনপ্রিয় জাতগুলো থেকে ফলন ছাড়াও কোনো না কোনো দিক দিয়ে উন্নত। উদ্ভাবিত বোরো জাতগুলোর জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ এর কাছাকাছি বা কিছুটা কম হলেও ফলন বেশি। ফলন সমান সমান হলেও বিশেষগুণে গুণান্বিত। যেমন– ব্রি ধান-৮০ এর চাল থাইল্যান্ডের জেসমিন-এর মতো। ব্রি ধান-৮১ এর চাল জিরা শাইলের মতো। ব্রি ধান-৭৪ জিঙ্কসমৃদ্ধ এবং ব্লাস্ট রোগ সহনশীল। ব্রি ধান-১০১ ব্লাস্টরোগ সহনশীল। ব্রি ধান-১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান-১০০) জিঙ্কসমৃদ্ধ এবং ব্রি ধান-১০৪ বাসমতি টাইপ। ব্রি ধান-২৮ এর কাছাকাছি জীবনকালের আরও কিছু জাত হলো ব্রি ধান-১০১, ব্রি ধান-১০৫। এদের ফলন ব্রি ধান-২৮ থেকে অনেক বেশি। যদিও ২০১৪ সালে উদ্ভাবিত একই জীবনকালের সার-সাশ্রয়ী বোরোর ধান ব্রি ধান-৬৯ একটি নতুন ধরনের সংযোজন। জাতটি ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য বিশেষ উপযোগী। এরকম ডায়াবেটিক রোগীবান্ধব আরেকটি জাত হলো ব্রি ধান-১০৫। ব্রি উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতগুলোর জীবনকাল ব্রি ধান-২৮ থেকে কিছুটা কম বা কাছাকাছি হলেও ফলন হেক্টরপ্রতি সহজেই ১০ টন ছাড়িয়ে গেছে। ব্রি ধান-২৯ এর বিকল্প ব্রি ধান-৮৯। ফলন ব্রি ধান-২৯ থেকে হেক্টরপ্রতি অন্তত এক টন বেশি। এমন ধরনের আরেকটি জাত হলো ব্রি ধান-৯২। জাতটির ফলন অনেক বেশি, গাছ শক্ত, চাল লম্বা ও চিকন। সাম্প্রতিককালে ব্রি ধান-২৮ বা ব্রি ধান-২৯ ব্লাস্ট বা অনুরূপ কিছু রোগবালাই সংক্রান্ত অনেক সমস্যায় জর্জরিত। এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেশ খানিকটা চিন্তাযুক্ত। তাহলে কি এ জাত দুটো মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হবে! প্রজনন এবং ভিত্তি বীজ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে চাষিদেরকে নিরুৎসাহিত করা হবে! এ বিষয়ে একক সিদ্ধান্তে না গিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটা আলোচনা হওয়া দরকার আছে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য চাইছেন জাত দুটো প্রতিস্থাপিত হোক। আগেই বলেছি, এদের বিকল্প জাত বিজ্ঞানীদের হাতে আছে। কিন্তু সেগুলো মাঠের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিশ্চয়ই বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। যে ব্লাস্ট রোগ নিয়ে কথা হচ্ছে, সেগুলো তো শুধু ব্রি ধান-২৮ বা ব্রি ধান-২৯ এর জন্য ভয়ের কারণ নয়। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সব ধরনের জাতই কমবেশি এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়াও আরও নানা ধরনের সমস্যা আছে। আমাদের চাওয়া অল্প দিনের উচ্চ ফলনশীল জাত। আগাম আবাদ এবং সারের অপব্যবহার অনেক সময় ব্লাস্টসহ নানা রোগবালাইয়ের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়। তাই ব্রি ধান-৬৭ বা ব্রি ধান-৬৩, ব্রি ধান-৮৪ বা ব্রি ধান-৮৬ জাতগুলো ব্লাস্টরোগের শিকার হচ্ছে। ব্রি ধান-৮৯, ব্রি ধান-১০২কে ব্রি ধান-২৯ এর বিকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। আমরা জানি, ব্রি ধান-২৯ উচ্চ তাপামাত্রার কাছে কিছু দুর্বল। ফুলফোটা অবস্থায় এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথম দিকের তাপমাত্রার ধকল সহ্য করতে পারে না। কোনো কারণে ব্রি ধান-৯২ ও বা ব্রি ধান-১০২ জাত দুটো একটু নাবি হয়ে গেলে এ ধরনের উচ্চ তাপমাত্রার শিকার হতে পারে। যদিও ব্রি উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের দোরগোড়ায়।

হোক, ধানের জাত প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি অবিরত প্রক্রিয়া। এজন্য বিজ্ঞানীদের যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। বিনাও (বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট) যুগোপযোগী (বৈরী পরিবেশে সহনশীল ও প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস) জাত উদ্ভাবন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি ও কর্পোরেট সংস্থাগুলোও এগিয়ে আসছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে (বিএডিসি) স্থান ও পরিবেশভিত্তিক উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে সাম্প্রতিককালের উদ্ভাবিত জাতগুলোর বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বীজ হাতে পেলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালানো সহজ হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে, কৃষি নিয়ে বাণিজ্য করতে হবে, কিন্তু কৃষক সমাজকে বাদ দিয়ে নয়। এসব কাজের মাঝেই তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, গণস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই।

জাত যতই ভালো হোক না কেন, যথাযথ পরিচর্যা না পেলে ফলন দেবে না। তাই পরিচর্যাটা কেমন হবে সেটা জাত অবমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিতে হবে। স্থান-কাল-পরিবেশভেদে পরিচর্যা পদ্ধতি এক হতে পারে না। নিবিড় চাষের দোহাই দিয়ে একই জাত একাদিক্রমে একই জমিতে বারবার চাষ করা যাবে না। পাশাপাশি জমিতেও এক জাত চাষ করা যাবে না। যদি সমলয় (Synchronized cultivation) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, তাহলে জীবনকাল ঠিক রেখে জাত অদল-বদল করে চাষ করতে হবে। আবহাওয়া ও বালাই পূর্বাভাষ জোরদার করতে হবে। প্রতিষেধক হিসেবে পরিবেশ ও কৃষক-বান্ধব বালাই নাশক ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে। জরুরি বিষয় হলো, কোনো জাতই পাঁচ বছরের বেশি মাঠে রাখা যাবে না। এজন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনে একটু কঠোর হতে হবে। নইলে শুধু ধান নয়, কোনো ফসলকেই রক্ষা করা যাবে না।

লেখক : মহাপরিচালক (ভূতপূর্ব), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন